বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের ভূমিকা

রাজা কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি শুধু বিজয়নগর সাম্রাজ্যেই নয়, মধ্যযুগের ইতিহাসে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সবদিক দিয়ে গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে। তাঁর রাজত্বকাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "He is one of the most distinguished and powerful Kings of Vijayanagar, who fought with Muslims of the Deccan on equal terms and avenged the wrongs that had been done to his predecessors." [তিনি ছিলেন বিজয়নগরের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও শক্তিশালী নরপতিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমমর্যাদায় যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।]

তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে নির্ভীক ও সুচতুর যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণদেব রায় বাহমনী রাজ্যের সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বাহমনী রাজ্যের সুলতান মাহমুদ শাহ বিদর ও অন্যান্য সামন্তরাজাদের সাহায্যে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করেন। যখন এই মুসলিম সম্মিলিত বাহিনী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ডোনি নামক স্থানে পৌঁছায়, তখন বিজয়নগরের সেনাবাহিনী তাদের গতি রুদ্ধ করে দাঁড়ায় এবং মুসলমান সেনাবাহিনী কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। সুলতান মাহমুদ শাহ স্বয়ং আহত হন এবং বাহমনী সুলতানের সেনাবাহিনী ও সামন্তরাজারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। পলায়মান বাহমনী সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করে কৃষ্ণদেব

কোবেলকোণ্ডা নামক স্থানে তাঁদের বিরুদ্ধে পুনরায় আর একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধেও কৃষ্ণদেব রায় জয়লাভ করেন। বিজাপুরের আদিল খান এই যুদ্ধে নিহত হন। আদিল শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুরের শিশু সুলতানি রাজ্য চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সুযোগে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে রায়চুর অধিকার করেন। তারপর তিনি বারিদ-ই-মালিক ও তাঁর মিত্রগণকে পরাজিত করে গুলবর্গা দুর্গ অধিকার করেন এবং দুর্গটি ধূলিসাৎ করেন। সিওয়েল তাঁর *A Forgotten Empire* নামক গ্রন্থে এই দুর্গ ধ্বংসের রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, "It diminished the prestige of Adil Shah so much that he ceased to think of further conquest in south. The other Muslims of the Deccan began to plan measures in order to break the preponderance of the Vijaynagar Empire. The Hindus were so elated with this victory that their insolence and hauteur made then the objects of universal hatred in Muslim Circles." [এতে আদিল শাহের মর্যাদা এত ক্ষুণ্ণ হয় যে তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযান করার চিন্তা থেকে বিরত হন। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমানগণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গুরুত্বকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা শুরু করে। হিন্দুগণ এই জয়ে এত উল্লসিত হয় যে তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা মুসলমানগণের নিকট তাদের ঘৃণার পাত্র করে তোলে।] এরপর তিনি বারিদকে অনুসরণ করে বিদরের দুর্গ অধিকার করেন। কৃষ্ণদেব মাহমুদ শাহকে পুনরায় বাহমনীর ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। এই কাজে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে Dr. N. Venkataramanayya বলেছেন, কৃষ্ণদেব রায় শুধুমাত্র একজন নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক সুচতুর রাজনীতিক। তিনি মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্যগুলিকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণদেব জানতেন যে, বাহমনী রাজ্যের যতদিন ছায়া ও কায়া থাকবে, ততদিন দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ বজায় থাকবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের এই বিশৃঙ্খলাই তাঁকে রাজনৈতিক সুবিধা দান করবে।

তারপর কৃষ্ণদেব উন্মত্তুরে পলিগারদের বিরুদ্ধে প্রায় দু'বছর যুদ্ধ চালিয়ে পলিগারদের শক্তির উৎস দক্ষিণ মহীশূরের সেরিঙ্গাপতম ও শিবসমুদ্রম দুর্গ অধিকার করেন। কৃষ্ণদেব এই সময় ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ, গজপতি বিজয়নগরের উদয়গিরি ও কোণ্ডভিডু নামে দুটি রাজ্য ইতিপূর্বে দখল করেছিলেন, যা কৃষ্ণদেব রায়ের পূর্বপুরুষ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণদেব প্রথম পর্যায়ে উদয়গিরি উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়

পর্যায়ে তিনি কোণ্ডভিডুতে অভিযান করেন। এই অভিযানকালে প্রতাপরুদ্রদেব, গোলকুণ্ডা ও বিদরের সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, কৃষ্ণদেব কন্দকুর, বিনুকোণ্ড, বেল্লমকোণ্ড, নাগার্জুনিকোণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলগুলি থেকে উড়িষ্যাবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে বেজওয়াদা, বেঙ্গী ও তেলেঙ্গানার কিছু অংশ কৃষ্ণদেব নিজ অধিকারে আনেন। কিন্তু গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়েও কৃষ্ণদেবের অধীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন কৃষ্ণদেব উড়িষ্যার রাজধানী কটক আক্রমণ করেন এবং গজপতি পরাজিত হয়ে নিজকন্যার সঙ্গে কৃষ্ণদেবের বিবাহ দিয়ে এক সন্ধি স্থাপন করেন। গজপতি হঠাৎ কেন সন্ধি করতে বাধ্য হন, সে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। নূন্যিজ-এর মতে, বীরভদ্র এই সময় বিজয়নগরে বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। আবার আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, গজপতি শত্রুদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে কৃষ্ণদেব গজপতিকে কৃষ্ণানদীর উত্তরের উপকূলভাগ ছেড়ে দেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক বুদ্ধিদীপ্ত সামরিক যুদ্ধের অবসান ঘটে।

এইসব অভিযানের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়—পশ্চিম-দক্ষিণে কোঙ্কন, পূর্বে বিশাখাপত্তনম এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। এমনকি, ভারতসাগরস্থিত কয়েকটি দ্বীপেও তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষ্ণদেব সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পর তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল সাম্রাজ্যের সংগঠন ও শান্তিমূলক শাসনকার্যে অতিবাহিত করেন।

কৃষ্ণদেবের আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চরম বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময় পর্তুগীজরা গোয়া দখল করে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে তাদের নেতা আলবুকার্কের সঙ্গে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এমনকি, কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে একটি পর্তুগীজ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েস কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যবহারের ও শাসনদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

কৃষ্ণদেব রায় শাসক হিসাবেও চরম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ও প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বিদেশীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এক শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। এ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও সদ্‌গুণের জন্য তিনি সকলের কাছেই দৃষ্টিনন্দন ছিলেন, একথা পায়েস তাঁর বিবরণে লিখে গেছেন। এমনকি, তিনি অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ছিলেন সে বর্ণনাও পায়েস দিয়েছেন। কৃষ্ণদেবের অধীন বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে এক দুর্ধর্ষ নৌশক্তি ও সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য সমগ্র দেশে প্রতি বছর পরিভ্রমণ করতেন। চাষী ও চাষের উন্নতির জন্য তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। পায়েস তাঁকে মহান শাসক ও ন্যায়-বিচারক বলে বর্ণনা করেছেন। বারবোসা বলেছেন, তিনি নিজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও প্রজারা নিজেদের ধর্মমত পালন করতে পারত। বিদেশীদের সঙ্গেও তাঁর আচরণ উদার ও সহৃদয় ছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাই তাঁর কাছে ন্যায়-বিচার পেত। কৃষ্ণদেব রায় সম্পর্কে তাই ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, "একদিকে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের যুদ্ধ, আবার অপরদিকে জনসাধারণের কল্যাণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁকে এক অনন্য স্থানের অধিকারী করেছে।" তিনি বিজয়নগরের নিকটে একটা শহর নির্মাণ করেছিলেন এবং একটি বিরাট পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। এই পুষ্করিণী থেকে জলসেচের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি নিজে একজন তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে তেলেগু সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। 'অষ্টদিগ্‌গজ' নামে আটজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর রাজ্যসভা অলঙ্কৃত করতেন। Dr. N. Venkataramanayya বলেছেন, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কৃষ্ণদেবের শাসনকালে যেমন এক বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তেমনি তেলেগু সাহিত্যের যে আজ সমুন্নতি তার মূলে ছিল কৃষ্ণদেবের বাধাহীন পৃষ্ঠপোষকতা। ড. কৃষ্ণ শাস্ত্রীও বলেছেন, নিজে বৈষ্ণব হয়েও অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর উদারতা ও সহনশীলতা তাঁকে ভারতইতিহাসে 'মহান' করেছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত কর্মকুশলতার জন্যই বিজয়নগর সাম্রাজ্য এ সময় গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম-শিখরে আরোহণ করেছিল। তাই কৃষ্ণদেব রায় সম্পর্কে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "There is no ruler among the sovereigns of the Deccan, both Hindu and Muslim, who can stand comparison with the Krishna Deva Raya." [দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলমান সার্বভৌম শাসকদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যাঁকে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।]